স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা

সংক্ষিপ্তসার:

দেশ বিভাজন এবং উদ্বাস্তু অভিবাসন ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যে ঘটনায় নিমজ্জিত রয়েছে অগণিত মানুষের তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনা। এই বিভাজনে বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠী শুধুমাত্র তার বাস্তুভিটে হারায়নি, হারিয়েছিল নিজের পরিচয়ও (identity)। দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে আসা অসহায় বাস্তুহারা মানুষরা 'উদ্বাস্তু' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই ছিন্নমূল মানুষগুলি নিজেদের জীবনের চরম বিপদের দিনে আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে নতুন জায়গায় নিজেদের ঠাঁই খোঁজার জন্য লড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে উদ্বাস্তু কলোনি নির্মাণ করেছে। এই কলোনিগুলিকে 'দেশভাগের স্মারক' বলা যেতে পারে।

দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম ও উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা পত্রটির কথা ভাবা হয়েছে। যাঁদের ত্যাগ, বঞ্চনার উপর নির্ভর করে স্বাধীন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিস্থাপন হয়েছে তাঁদের স্মরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে সেভাবে আলোচনা করা হয়নি বলে, একে 'ইতিহাসের এক অদ্ভুত মূক-বধির অবস্থান' বলে ভাবা হয়। উদ্বাস্তু কিংবা অভিবাসন নিয়ে গতানুগতিক আলোচনা বহুবার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই অভিবাসনে, কলকাতার শহরতলির উদ্বাস্তু জবরদখল কলোনির কথা সেভাবে পাওয়া যায় নয়। তাই এই গবেষণাতে এমন কতগুলি উদ্বাস্তু কলোনির কথা বলা হয়েছে, যাদের নিয়ে সেভাবে ভাবা হয়নি। কিভাবে এই কলোনি গড়ে ওঠে তা ভাবা দরকার। সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনার সংযোগে নতুন আঙ্গীকে শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ বিভাজনের পর পশ্চিম পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে অভিবাসিত হয়ে যে মানুষেরা উদ্বাস্তু বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছানোর পর তাঁদের কি হল, কেমন করে তাঁদের জীবন প্রতি মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল এ বিষয়ে তেমন আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। এই অভাববোধ থেকেই উদ্বাস্তু বিষয়ক আলোচনাকে এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়রূপে ভাবা হয়েছে।

আমার গবেষণা পত্রটি মূলত চারটি অধ্যায় দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি অধ্যায় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, যে প্রশ্ন গুলির উত্তর সন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা।

প্রথম অধ্যায় উদ্বাস্তু অভিবাসন কখন ও কীভাবে, কোন সময়, কোন পরিস্থিতিতে সম্ভব হয়েছিল, উদ্বাস্তুরা কোন কোন সময়ে অভিবাসিত হয়েছিল ও তার বিভিন্ন দিকগুলি দেখা হয়েছে। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত হয়ে এলে সরকারের পদক্ষেপ কি ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গেরইবা এই প্রসঙ্গে কি ভূমিকা ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে, বিমান সমাদ্দারের 'শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনিঃ আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান', একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উদ্বাস্তু কলোনির নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও, তাঁর আলোচনাতে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে সরকারের কি ভূমিকা ছিল বা কতটা ভূমিকা ছিল সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ পরিচালনার জন্য একেবারে শীর্ষ স্থানে ছিল 'উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর' (Refugee Relief and Rehabilitation /RRR Department)। এই দপ্তর কখন, কিভাবে নির্মিত হয়েছে, এর গঠনশৈলী (Structure of RRR Department), কারা এই দপ্তরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, কিভাবে এই দপ্তর উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে কাজ করেছে, তাদের কাজের ধরণ, তাদের কাজের সফলতা কিংবা বিফলতা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচ্য গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সরকারি রিপোর্ট, ম্যানুয়েল এবং হ্যান্ডবুক সমস্ত কিছুতে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে, সরকারের একাধিক পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা, তাদের কাজ করার পদ্ধতি, চিন্তাভাবনাতে নানান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে একাধিকবার। উদ্বাস্তু বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় তার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তু বসতি বা কলোনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে মৌখিক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষের অতীত ও বর্তমান তাদের জীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বদলে গিয়েছে তাদের জীবন, তা এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়। উদ্বাস্তু কলোনি কিভাবে গড়ে উঠেছে, কত

রকমের কলোনি রয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্য, কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কেন একটি কলোনি আরেকটি কলোনির থেকে পৃথক, কলোনি নির্মাণে কলোনি কমিটির কি ভূমিকা ছিল, কলোনি কমিটি কিভাবে কলোনিতে কাজ করেছে, কিভাবে এটি নির্মিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। কলোনি কমিটির পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকালীন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিবর্গ কিভাবে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে নিজেদের কাজ করেছিলেন তা দেখা হয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বসতি নির্মাণে বা কলোনি স্থাপনে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন প্রয়োজন কিংবা অধিকার আদায়ে এই রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরা কিভাবে কাজ করেছিল এই সমস্ত বিষয় আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক।

এই অধ্যায়ে বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। যেহেতু এই প্রসঙ্গ একটি বৃহৎ ও বিস্তারিত ক্ষেত্র, তাই আলোচনার সুবিধার্থে মূলত কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর ক্ষেত্রটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। যাদের নিয়ে এর আগে কথা বলা হয়নি। অথচ এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির প্রতিটির নির্দিষ্ট কিছু ইতিহাস রয়েছে। আজও এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির বুকে শ্বাস নেয় দেশবিভাজনের অভিঘাত। সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই উঠে এসেছে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্বাস্তু জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলো। যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পোদ্দার নগর কলোনি, কাটজু নগর কলোনি, কামালগাজি লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি, সংহতি কলোনি, সন্তোষপুর বিধান কলোনি, বিবেকনগর কলোনি, আজাদগড় কলোনি।

নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে নতুন জীবন শুরু করেছে, কঠিন সময়ে জল সরবরাহ, জল নিষ্কাসন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার, জমির মালিকদের এবং তাদের ভাড়াটে গুন্ডাদের অত্যাচার, জঙ্গলময় জায়গাতে সাপেদের উপদ্রব কিভবে উদ্বাস্তুরা মোকাবিলা করেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি শুধুমাত্র বিবাদ বা বৈপরীত্য তুলে ধরেনি, তার সাথে মুখের কথায় উঠে আসে এমন তথ্য যা বন্ধ জানালা খুলে দেয়। অন্যদিকে তাদের সাংস্কৃতিক গুণাবলী, বেঁচে থাকার আন্দোলনের মতন প্রতিটি ক্ষেত্র এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলীর উদ্বাস্তু জীবন, সাংস্কৃতিক রূপায়ন এবং পারস্পারিক দ্বান্দিকতা ও দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন, যার মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বাস্তু আসেন পশ্চিমবঙ্গে। আবার উদ্বাস্তু অভিবাসনের ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অন্যতম। বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় দাঁড়িয়ে আছে এই কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে থাকা উদ্বাস্তুদের জীবনের ইতিহাস ও বর্তমানকে কেন্দ্র করে। এই শহরতলীর উদ্বাস্তুরা কি কারণে এই অঞ্চলকে নির্বাচিত করেছিল তা বিচার্য বিষয়। অভিবাসনের পর থেকে বর্তমান সময়ের নিরিখে, দক্ষিণ শহরতলীর উদ্বাস্তুদের জীবন কিভাবে বদলে গিয়েছিল তাদের এই বদল কোন পথে, কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা বিবেচ্য। বাঙাল- এদেশীয় সম্পর্কের টানাপড়েনও এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজকে সঠিকভাবে করার জন্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে।

উদ্বাস্তু সমাজের দ্বন্দ্ব-ও এই অধ্যায়ের মূল প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই দ্বন্দ্বকে মূলত দুটি ভাবে ভাগ করে আলোচনার প্রেক্ষিত নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার পারস্পারিক দ্বন্ধ। চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচারণে, খাদ্যাভ্যাসে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তাতেও তা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা, বরিশালের উদ্বাস্তুরা তাদের রান্নায় ঝালের ব্যবহার করেন অতিমাত্রায়, কিন্তু অন্যান্য উদ্বাস্তুরা যেমন ফরিদপুর, নোয়াখালি এরা রান্নায় মিষ্টি ব্যবহার করেন। প্রত্যেকেই বাঙাল ভাষায় কথা বললেও, বাঙাল ভাষার টান বা কথা বলার ধরণ কিন্তু আলাদা। এগুলিকে আমরা 'নোয়াখাইল্যা ভাষা', 'ঢাকাইয়া ভাষা', 'চাটগাঁইয়া ভাষা', 'ফরিদপুরি ভাষা' এইভাবে একেকটা জায়গা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভাষাকে একেকরকম ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিষয়গুলি উদ্বাস্তুদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্টের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, একটা সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষ কলোনি নির্মাণের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই ব্যক্তিই পরবর্তীকালে তার পরিবারে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে। শুধু তাই নয় সংসারে, নিজ সন্তান, আঞ্চলিক প্রোমোটারদের বাড়াবাড়িতে, বাধ্য হয়েছে নিজের বাড়ি জমি তাদের হাতে তুলে দিতে। আজ একককক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়ে গিয়েও মনের গভীরে তিনি আজও সযত্নে লালন করে চলেছেন তার উদ্বাস্তু জীবন, এই আলোচনা তাদের প্রসঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকটকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্য ও স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে। উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে যে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তু নারীকে 'নির্যাতিত', 'লাঞ্ছিত', 'অপমানিত', কিংবা 'ধর্ষিতা' রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু অভিবাসন এমন এক নারী সমাজেরও জন্ম দিয়েছিল যে নারী সমাজ বিদ্রোহ করতে শিখেছিল, যে নারী সমাজ সীমাবদ্ধতা, কুসংস্কার, অন্ধকারকে

পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শিখেছিল। এমনকি পারিবারিক জীবনে মাথা হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যায় এই সকল মেয়েদের প্রসঙ্গে।

এই আলোচনাকে বাস্তবসম্মত করার উদ্দেশ্যে একদিকে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির উদ্বাস্তু মহিলাদের কি কি আলাদা বৈশিষ্ট্য, তাদের মধ্যেকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জীবন ধারার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় সেই বিষয়গুলিকে যেমন মনে রাখা হয়েছে, আবার অন্যদিকে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, পি এল ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প কিংবা গয়েশপুর কলোনির মহিলাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা ধরার চেষ্টা হয়েছে। তাদের সামাজিকবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক সচেতনতার জায়গাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে মূলত কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্যিক উপাদান কে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কলোনি ও ক্যাম্পের উদ্বাস্তু মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদেরই মুখে, তাদের জীবনের নানান অভিজ্ঞতাকে ক্ষেত্র সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন 'বাঙালি মহিলা' বা 'উদ্বাস্তু মহিলা' শুধুমাত্র উদ্বাস্তু ভদ্র মহিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্বাস্তু সমাজের দারিদ্র, কলোনি ও ক্যাম্পে বসবাসকারী মহিলাদের উদ্বাস্তু জীবন, পুনর্বাসন এবং কর্মজীবনে তাদের লড়াইয়ের কথাও গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পরে এক শ্রেণির নারীরা সমাজ সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি নির্মাণের সুযোগ পেলেও, আরেক শ্রেণির উদ্বাস্তু মহিলাদের সেই সুযোগ এত সহজে আসেনি। কিন্তু একথা সর্বাগ্রে স্বীকার করে নিতে হবেই যে, লড়াইয়ের পথ কঠিন হলেও, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমগ্র নারী সমাজের কাছে একটা 'আত্ম পরিচিতির জগৎ' নির্মাণের দরজা খুলে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শহরের কলোনির উদ্বাস্তু মহিলারা যেমন জীবিকার সন্ধানে প্রতিদিন সংগ্রাম করেছে, পরিবারিক দায়িত্ব পালন করেছে, একইভাবে পিছিয়ে থাকেনি শহর থেকে দূরে ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তু মহিলারাও। তারা ক্যাম্পের আভ্যন্তরীণ নানান বিষয়ে জোটবদ্ধতা নির্মাণ করেছে, এক হয়ে প্রতিবাদ করেছে, বিক্ষোভ করেছে, পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। উদ্বাস্তু অভিবাসন জন্ম দিয়েছিল এমন এক নারী সমাজের যা বাঙালি হিন্দু সমাজ আগে কখনও দেখেনি। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, দেশবিভাজন শুধুমাত্র ধ্বংস বা বিপন্নতাই নিয়ে আসেনি ভয়ংকর দিনেও লড়াই করার অফুরাণ প্রাণ শক্তি যুগিয়েছিল।

সূচক-শব্দাবলী:

দেশভাগ, উদ্বাস্তু, অভিবাসন, উদ্বাস্তু কলোনি, উদ্বাস্তু ক্যাম্প, পুনর্বাসন।